Jagannath University Journal of Arts, Vol. 9, No. 2, July–December 2019
ISSN 2519-5816

ময়নামতি জাদুঘরে সংরক্ষিত পোড়ামাটির ফলকচিত্র: সমকালীন আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতিফলন

মোঃ শাহ আলম*

Abstract: Terra-Cotta is one of the principal ancient symbolic representations of human being which contains human, animal and various floral plaques. Terracotta plaques are found in different archaeological places of Harappa and Mahenjadaru. Terra-cotta plaques are also found in several historical places of Bangladesh. Some terracotta plaques found from Shalban Bihar, Ananda Bihar, Itakhola Mura, Rufban Mura etc. have been preserved in 'Mainamati Museum' in Cumilla. This study is the Socio-Economic and Cultural explanation of these terra-cotta which are preserved in 'Mainamati Museum', Cumilla.

ভূমিকা

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় জেলা কুমিল্লার ঐতিহাসিক নিদর্শন ও পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে ময়নামতি প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ১৯৫৪-৫৬ সময়ে কুমিল্লা অঞ্চলের প্রত্নতত্ত্ববিদ এফ.এ খান এর তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন স্থানে জরিপের মাধ্যমে ৫৫ টি প্রত্নস্থল সনাক্ত করা হয়।[১] পরবর্তীতে উৎখননের ফলে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তু সংরক্ষণের জন্য ময়নামতি প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর নির্মাণ করা হয় ১৯৬৫ সালে।[২] তৎকালীন মানুষের তৈরী কীর্তিনিদর্শন এবং পোড়ামাটির ফলক নিয়ে ময়নামতি জাদুঘর শিল্প, কলা, ধর্ম, ক্রিয়া, প্রাণী ও অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ করেছে। প্রাচীন বাংলার সমতট অঞ্চলে বেশ কিছু রাজবংশ তাদের শাসনকার্য পরিচালনা করে তাদের মধ্যে ষষ্ঠ শতাব্দীতে গুপ্ত ও ভদ্র রাজবংশ, সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধে খড়্গ বংশ, অষ্টম শতাব্দীতে দেব ও চন্দ্র বংশ আবির্ভাবে কুমিল্লা অঞ্চলের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন সাধিত হয়।[৩] ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মুসলমানদের আগমন এবং প্রাচীন রাজবংশের অবসান ঘটে। ষষ্ঠ-ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কুমিল্লা অঞ্চলে গড়ে উঠা বিভিন্ন রাজবংশের শাসনকালে এ অঞ্চলে মৃৎশিল্পের পাশাপাশি পোড়ামাটির ফলকচিত্রের বিকাশ ঘটে এবং রাজারা এই শিল্পের পৃষ্ঠ-পোষকতা করেন। এতে কুমারদের যেমন জীবন যাত্রার পরিবর্তন হয় তেমনি রাজাদের এবং সাধারণ মানুষদের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব-প্রতিপত্তি লক্ষ করা যায়, যা সমসাময়িক সময়ের বিভিন্ন প্রত্নস্থল (শালবন বিহার, কুটিলা মুড়া, রূপবান মুড়া, ইটাখোলা মুড়া, ত্রিরত্ন মুড়া প্রভৃতি) থেকে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলকসমূহ থেকে জানা যায়।[৪] পোড়ামাটির এসব ফলকে যে সকল নকশা বা চিত্র পাওয়া যায় তা থেকে তৎকালিন সমাজ-সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক অবস্থার চিত্র ফুটে উঠে। তাদের ব্যবহৃত এই সকল পোড়ামাটির ফলকচিত্রে মানব-মানবী, নর্তক-নর্তকী, মল্লযোদ্ধা, তীরন্দাজ, মাছ, কীর্তিমুখ, ধর্মচক্র, পশুপাখি, পোষা প্রাণী, ফুল-ফল, লতা-পাতা ইত্যাদি সহ বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয় স্থান পায়।

* এমফিল গবেষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ

গবেষণা পদ্ধতি

বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে একটি বিষয়ের উপর গবেষণা করা যায়। তবে “ময়নামতি জাদুঘরে রক্ষিত পোড়ামাটির ফলকচিত্র: সমকালীন আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতিফলন” এর উপর গবেষণা করতে গিয়ে দুই ধরনের পদ্ধতি অনুসরন করা হয়েছে তা হলো-

১. ঐতিহাসিক পদ্ধতি

পোড়ামাটির ফলকচিত্র বিষয়ে গবেষণা করতে গিয়ে বিভিন্ন ঐতিহাসিক গ্রন্থ, পৌরনিক আখ্যান ও লৌকিক চিত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এই সকল পৌরনিক আখ্যান ও ঐতিহাসিক গ্রন্থে কুমিল্লার “ময়নামতি জাদুঘরে রক্ষিত পোড়ামাটির ফলকচিত্র: সমকালীন আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতিফলন” সম্পর্কে কিছু সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায়। এসকল গ্রন্থ গুলো পঠন পাঠনের মাধ্যমে একটি সুনির্দিষ্ট মত পেশ করা হয়েছে।

২. জরিপ পদ্ধতি

এছাড়াও আরেকটি পদ্ধতি গ্রহন করা হয়েছে, তা হল জরিপ পদ্ধতি। মূলত এই গবেষণা কর্মটি হলো একটি জরিপের ফলাফল। এই জন্য কুমিল্লার ময়নামতি জাদুঘর সংরক্ষিত ও প্রদর্শিত বিভিন্ন ধরনের নিদর্শনের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করি এবং ময়নামতি-লালমাই অঞ্চলের বিভিন্ন প্রত্নক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ করে একটি সুনির্দিষ্ট মূল্যায়ন পেশ করা হয়েছে।

গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

এই গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সঠিক বাস্তবায়নের লক্ষ্যে S.J. Kundson (1978) এর "Culture in Retrosprot" এবং Peter L. Drawelt (1999) এর "Field Archaeology and Introduction" গ্রন্থ দুটো অনুসরন করা হয়েছে। এই গবেষণার প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কুমিল্লা জেলার ময়নামতি জাদুঘরে সংরক্ষিত পোড়ামাটির ফলকচিত্র সমূহ পর্যবেক্ষন ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে কুমিল্লা জেলার তথা ময়নামতি-লালমাই অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতি জীবনের চিত্র তুলে ধরা । তবে সামগ্রিকভাবে এই গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য গুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

- কুমিল্লা জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে তথ্য উপস্থাপন করা।
- ময়নামতির প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘরে সংরক্ষিত পোড়ামাটির ফলকচিত্র নিদর্শন থেকে সমকালিন আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা সর্ম্পকে তথ্য উপস্থাপন করা।
- লালমাই-ময়নামতি অঞ্চলের প্রত্নস্থল ও প্রত্নবস্তু সম্পর্কে তথ্য উপস্থাপন করা ।
- ময়নামতি জাদুঘর সম্পর্কিত ও জাদুঘরে সংরক্ষিত প্রত্নবস্তু সম্পর্কে উপস্থাপন করা।
- জাদুঘরে সংরক্ষিত পোড়ামাটির নিদর্শন ও সময়কাল সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও উপস্থাপন করা ।
- প্রত্নস্থানের সার্বিক তথ্য জানার জন্য গবেষণা কার্য পরিচালনা করা প্রয়োজন।
- পর্যটন শিল্পের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তথ্য উপস্থাপন।

কুমিল্লা জেলার ময়নামতি অঞ্চলে বিভিন্ন প্রত্নক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলকচিত্র গুলো যা ময়নামতি জাদুঘরে সংরক্ষিত সে উপাদান গুলো এই গবেষণার প্রধান উপকরণ।

গবেষণার যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব

“ময়নামতি জাদুঘরে রক্ষিত পোড়ামাটির ফলকচিত্র: সমকালীন আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতিফলন” আলোচ্য প্রবন্ধটি প্রকাশিত হলে কুমিল্লা জেলার এবং প্রাচীন বাংলার সমতট অঞ্চলের ইতিহাস পূর্নগঠণে আরও নতুন তথ্য সংযোজিত হবে এবং গবেষক, সাধারণ পাঠক ও

সুধীজন কুমিল্লা জেলার ইতিহাস ঐতিহ্য ও পর্যটন কেন্দ্র সম্পর্কে আরও বিস্তারিতভাবে জানার ও দেখার সুযোগ পাবেন। এটি পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে সংরক্ষণ, সম্প্রসারণ, উন্নয়ন ও প্রচারে সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষকে আরও উৎসাহিত করবে বলে আশা করা যায়। ইতিহাস যেকোনো জাতির পরিচয় জানতে বিবেকের অনুপ্রেরণা ও আমাদের অস্তিত্বের প্রয়োজনেই ইতিহাসের শিকড় অনুসন্ধান করা জরুরি। চলমান সমাজের দর্পণ, সংবাদপত্র, ছবি, দলিল ও নথিপত্র ইতিহাসের স্বাক্ষী। কোন স্থানের শিল্পকর্ম বিষয়ের বিশেষ করে শিল্পকর্মের বিভিন্ন লিখিত, অলিখিত, অঙ্কিত ও স্থাপত্য বিষয় বিশ্লেষণ করে ঐ শিল্পকর্মের সঠিক ইতিহাস জানা যায়। আমাদের পর্যটন শিল্পের নীতি নির্ধারণেও আলোচনাটি সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। সুতরাং প্রবন্ধটির যৌক্তিকতা ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

সাহিত্য পর্যালোচনা

কুমিল্লার লালমাই-ময়নামতির অঞ্চলের প্রত্নস্থল ও প্রত্নবস্তু নিয়ে ইতিপূর্বের প্রকাশিত কিছু গবেষণা গ্রন্থ ও সাহিত্য যেমন- প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক এ.কে.এম সামছুল আলম এর লেখা 'Mainamati' (১৯৭৬), ড. মোঃ হারুনুর রশিদের পি.এইচ.ডি অভিসন্ধর্ভ 'The Early History of South East Bengal in the Light of Recent Archaeological Material' (1968), ব্যারি এম. মরিসনের 'Lalmai: a Cultural Centre of Early Bengal' (london, 1974), এ.বি.এম হোসেন সম্পাদিত 'Mainamati-Devaparvata' (Dhaka-1997), আয়শা বেগম এর লেখা 'প্রত্ননিদর্শন: কুমিল্লা' (২০১০), আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া সম্পাদিত 'বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ' (২০০৭) এবং মোহাঃ মোশারফ হোসেন ও তোফায়েল আহমেদ দেওয়ান সম্পাদিত 'ময়নামতি-লালমাই' (২০০৪) প্রভৃতি রচনা থেকে কুমিল্লা অঞ্চলের প্রাক-মুসলিম স্থাপত্য সম্পর্কে মোটামুটি একটি স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যায়। এই সকল গ্রন্থে কোথাও ময়নামতি প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘরে সংরক্ষিত পোড়ামাটির নিদশর্নে সমকালিক আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতিফলন নিয়ে সুস্পষ্ট কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় নি। এই প্রবন্ধে ষষ্ঠ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর কুমিল্লা অঞ্চলের মানুষের পোড়ামাটির ফলকচিত্র নিদর্শনে আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার উপর কিভাবে প্রভাব ফেলেছে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

অবস্থান

কুমিল্লা জেলার ৯০ ডিগ্রি ৩১ মিনিট থেকে ৯১ ডিগ্রি ২২ মিনিট পূর্ব দ্রাঘিমাংশ এবং ২৩ ডিগ্রি ১২ মিনিট থেকে ২৪ ডিগ্রি ১৬ মিনিট উত্তর অক্ষাংশে অবস্থিত। ৯০ ডিগ্রি পূর্ব গোলার্ধের ঠিক মধ্যভাগে অবস্থিত।[৫] কর্কটক্রান্তি রেখা কুমিল্লা জেলার উপর দিয়ে অতিক্রম করার জন্য এ জেলা সর্বোতভাবে ক্রান্তিয় অঞ্চলের অন্তর্গত। কুমিল্লা জেলাটির অবস্থান পৃথিবীর পূর্ব গোলার্ধের প্রায় মাঝামাঝি স্থানে।[৬] বৈন্য গুপ্তের ঘুনাইঘর তাম্রশাসনে পাওয়া যায় কুমিল্লা জেলা তৎকালিন সমতটের প্রধান কেন্দ্র ছিল।[৭] চট্টগ্রাম বিভাগের অধীনে কুমিল্লা জেলার অবস্থান গোমতী নদীর তীরে এবং লালমাই পাহাড়ের পাদদেশে এর আয়তন ৩০৮৫.১৭ বর্গ কি.মি এর উত্তরে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা, উত্তর-পশ্চিমে নারায়নগঞ্জ জেলা, দক্ষিণে নোয়াখালী ও ফেনী জেলা, পূর্বে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য এবং পশ্চিমে মুন্সিগঞ্জ ও চাঁদপুর জেলা।[৮]

কুমিল্লা শহর থেকে ৮ কি.মি. পশ্চিমে অবস্থিত উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত অনুচ্ছ, অপ্রশস্ত ও বিচ্ছিন্ন বিন্যাসে বিন্যস্ত টিলাগুলোর উত্তরের অংশ ময়নামতি এবং দক্ষিণের অংশ লালমাই নামে পরিচিত।[৯] এ অঞ্চলের উত্তর-দক্ষিণে ১৮ কি.মি. দীর্ঘ, গড়ে ৪.৫কি.কি. প্রশস্ত, গড় উচ্চতা ২১

মিটার এবং মোট আয়তন প্রায় ৩৪ বর্গ কি.মি.। এ অঞ্চলে টিলাগুলো মাটির রং লাল। ভূমির উপরি ভাগে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছড়ানো অসংখ্য কাঠের ফসিলের টুকরা পাওয়া যায় যা মাটির প্রাচীনত্বসহ ভূমন্ডলীয় পরিবর্তনের ইঙ্গিত প্রদান করে। আজ পর্যন্ত প্রত্নতাত্ত্বিক খননে এখান থেকে প্রচুর মূল্যবান প্রত্নসম্পদ ও প্রত্নবস্তু উন্মোচিত হয়েছে যা সমগ্র বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য বিনির্মানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে বিবেচিত।[১০] কুমিল্লার ময়নামতি-লালমাই টিলা অধ্যুষিত এলাকা শক্ত আঠালো গৈরিক রংয়ের প্রাচীন পলল দিয়ে গঠিত। এ অঞ্চলে সম্ভবত চতুর্থ (সর্বশেষ) হিমালয়ান ওরমেনসি (Himalayan Ormency) সময় কালে সৃষ্টি হয়েছে।[১১] এ এলাকাটি বাংলাদেশের অন্যান্য অংশের ভূ-পৃষ্ঠ থেকে বেশ উঁচু ও বন্যা মুক্ত। ঢাকা থেকে সরাসরি সড়ক পথে প্রত্নস্থলগুলোতে পৌঁছা যায়। কারণ, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক টিলা গুলোর বুকচিড়ে নির্মিত হয়েছে। এছাড়া রেলগাড়িতে চড়ে প্রথমে কুমিল্লা শহর তারপর রিকশা বা যে কোনো ধরনের মোটরযানে চড়ে সেই প্রত্নস্থলগুলোতে পৌঁছা সম্ভব।

পাড়ামাটির ফলকচিত্র (টেরাকোটা)

‘টেরা’ ‘কোটা’ শব্দ দুটি ল্যাটিন শব্দ ‘টেরা’ এবং ‘কোটা’ থেকে গৃহীত। ল্যাটিন ভাষায় ‘Terra’ শব্দের অর্থ ‘Earth’ বা মাটি। রোমান শব্দে Terra হচ্ছে পৃথিবীর দেবী। গ্রিকরা একে সম্বোধন করতেন বলে তাদের ‘Gaea’ বলে। অন্যদিকে cotta হচ্ছে ‘Cuocera’ এর স্ত্রীবাচক শব্দ যার অর্থ রান্না করা বা হিট দেওয়া। অর্থাৎ ‘cotta’ হচ্ছে baked বা পোড়ানো। টেরাকোটা শব্দটি দিয়ে পোড়ামাটিকে বুঝায়।[১২] টেরাকোটা সম্পর্কে ড. বরুণকুমার চক্রবর্তীর বলেন, “বাংলা শিল্প সাহিত্যে বর্তমানে সুপ্রচলিত লাতিন ভাষার একটি ইতালীয় যুগ্ম শব্দ। শব্দটির বুৎপত্তিগত অর্থ টেরা=মৃত্তিকা, কোটা=দগ্ধ, অর্থাৎ ‘দগ্ধ মৃত্তিকা’। চারুকলায় শব্দটি পোড়ামাটির শিল্পকর্মকে বুঝায়।”[১৩] মৃৎশিল্পীগন ছিলেন সমাজের নিচের স্তরের লোক।[১৪] পোড়ামাটির ফলকচিত্র এবং সকল মৃৎসামগ্রী আর্দেনওয়ারের অন্তভুর্ক্ত। প্রত্নতত্ত্ববিদ ও শিল্প সমালোচকদের মতে টেরাকোটা হলো গ্লেজবিহীন মৃৎসামগ্রী।[১৫] যেমন- হাঁড়ি, পাতিল, সরা, সটকা, সানকি, কলকে, হাতি, ঘোড়া, পুতুল, খেলনা, ফুলদানি, ফলকচিত্র ইত্যাদি। কাদামাটি দিয়ে তৈরি করে শুকিয়ে পোড়ানোর পর যে রুপ ধারন করে তাকেই টেরাকোটা বলে।

কাদামাটি দিয়ে স্ল্যাব তৈরি করার পর ‘লেদার হার্ড’ হলে খোদাই কিংবা মাটি পোস্টিং করে, কোনো দৃশ্য বা নক্শা করার পর তা ছায়ার মধ্যে শুকিয়ে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় পোড়ানোর পর তাকে পোড়ামাটির ফলক বা টেরাকোটা বলে। মাটি বা বডির উপর নির্ভর করে টেরাকোটার তাপমাত্রা ৭৫০°-১০০০° সে. পর্যন্ত হতে পারে।

প্রত্নতত্ত্ববিদগন টেরাকোটাকে ২ ভাগে ভাগ করেছেন।

- ❖ কালধর্মী (Age-bound)
- ❖ কালহীন (Ageless)

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রত্নস্থল থেকে লোকায়ত পোড়ামাটির ফলক পাওয়া গিয়েছে। সময় বা বয়স অনুযায়ী লোকায়ত ফলকচিত্র গুলো ৩টি ভাগে বিভক্ত।

১. আদি পর্ব
২. মধ্য পর্ব
৩. আধুনিক পর্ব বা সমকালীন

বাংলার পোড়ামাটির মন্দির, মসজিদ, বিহার, ভাস্কর্য ও স্থাপত্য শিল্পরীতিকে ডেভিড ম্যাক্কাচ্চন[১৬] নিম্নোক্ত ভাবে ভাগ করেন।[১৭]

বাংলার টেরাকোটা শিল্প

- প্রথম যুগ (সপ্তদশ শতক)
- মধ্যযুগ (অষ্টাদশ শতক)
- নব্যযুগ (উনিশ শতক)

'শিল্পকলা' শব্দটির অভিধানিক অর্থ সুকুমার শিল্প বা কারুশিল্প। শব্দটি মানুষের তৈরী বিভিন্ন প্রকার উপকরন সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়। অতি ক্ষুদ্র শিল্পকর্ম থেকে অতিকায় শিল্পকর্ম এর আওতায়ভূক্ত। সাধারণভাবে বলা যায় কোন কিছু সুন্দর করে আঁকা বা নির্মাণ করাই শিল্পকলা। আমাদের দেশে সবচেয়ে প্রাচীন শিল্প হলো মৃৎশিল্প। কুমার সম্প্রাদায় যুগ যুগ ধরে তেরী করে আসছে মাটির কলস, হাঁড়ি, সরা, বাসন, কোসন. পেয়ালা, সুরাই মটকা, জালা, পিটে তৈরীর নানা ছাঁচে, উৎসব পালনের জন্য নানা রঙ্গের বাহারি জিনিস তৈজসপত্র ইত্যাদি। মাটি হলো এ শিল্পের প্রধান উপকরণ। প্রত্নবিদদের ধারণা নব্য প্রস্তর যুগ থেকে মানুষ মাটির সামগ্রীর তৈরী করে তাদের জীবিকা নির্বাহ ও দৈনন্দিন কাজে ব্যবহার করে আসছে।[১৮] বাংলায় প্রাপ্ত অসংখ্য পোড়ামাটির ফলক প্রমাণ করে আমাদের দেশে সত্যতার উষালগ্ন থেকে সবচেয়ে সুলভ ও সহজ মাধ্যমই ছিল এই কাদামাটি। পরিষ্কার এঁটেল মাটি দিয়ে দেশের কুমার সম্প্রদায় বংশ পরম্পরায় যুগ যুগ ধরে তাদের হাতের নৈপুণ্য ও কারিগরি জ্ঞান দ্বারা এ কাজ করে আসছে। এর সাথে গড়ে উঠেছে পোড়ামাটির ফলকের কাজ যাকে ইংরেজীতে 'Terracotta Plaques' বলা হয়। টেরাকোটা শিল্প বাংলায় অনেক প্রাচীনকাল থেকে ব্যবহার হয়ে আসছে। নকশা করা মাটির ফলক সূর্যের তাপে অথবা ইটের মতো আগুনে পুড়িয়ে শক্ত এবং টেকসই করা হতো এই টেরাকোটা।

খ্রিস্টপূর্ব তিন শতক থেকে শুরু করে খ্রিস্টীয় ১২ শতক পর্যন্ত মৌর্য, শুঙ্গ, কৃষান, গুপ্ত, পাল ও সেন রাজাদের সময়ে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে পোড়ামাটির দ্রব্যাদি তৈরি ও ব্যবহার হতে শুরু হয়। তার প্রমাণ পাওয়া যায় কুমিল্লার ময়নামতি শালবন বিহার, নওগাঁ জেলার সোমপুর বিহার (পাহারপুর বৌদ্ধ বিহার) বগুড়ার মহাস্থানগড়, দিনাজপুরের কন্তিজির মন্দির থেকে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলকচিত্র।[১৯] পোড়ামটির ফলকচিত্র হিন্দুদের প্রাসাদ, মন্দির; বৌদ্ধ ধর্মের ব্যবহৃত বিহার ও ধর্মীয় উপাসানালয়; মুসলমানরা মসজিদ ও অন্যান্য প্রাসাদে ব্যবহার করেন। কাদামাটি ও স্থানীয় শিল্পী দ্বারা তৈরি এসব পোড়ামটির দ্রব্যাদিতে তৎকালিন সমাজ-জীবন, সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি জীবন্ত চিত্র পাওয়া যায়। ফলকগুলোতে বৈচিত্র ও বর্ণনার এক দক্ষতার প্রমাণও পাওয়া যায়। তবে কোন সুনিদির্ষ্ট নিয়ম-কানুন ও সঠিক কলাকৌশলের অভাব লক্ষ্য করা যায় এসকল চিত্রে। জীবনাবেগের প্রাচুর্য ও সহজ-সরল প্রকাশভঙ্গি চিত্রফলকগুলো এক অতুলনীয় প্রশংসার স্থান দখল করে আছে। পোড়ামাটির চিত্রগুলোতে গ্রাম-বাংলার মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, দেবতা ও অপদেবতার প্রতি তাদের বিশ্বাস এবং পাশাপাশি অবস্থানরত প্রাণীকূল ও উদ্ভিদ জগতের একটি প্রাণবন্ত ও উজ্জ্বলরূপ পাওয়া যায়।

পোড়ামাটির ফলকগুলোতে বিভিন্ন ধরনের চিত্র লক্ষ্য করা যায়। শিবের বিভিন্ন রূপ-ব্রহ্ম, বিষ্ণু, গণেশ, সূর্য প্রভূতি হিন্দু দেবদেবীর এবং বৌদ্ধ দেবদেবীর বোধিসত্ত্ব, মঞ্জুশ্রী প্রভৃতি মূর্তি

পোড়ামাটির চিত্রে স্থান পায়। এছাড়াও নানারকম লতাপাতা ও ফুলের মধ্যে পদ্মফুলের প্রাধান্য বেশি লক্ষ্য করা যায়। প্রাণীর চিত্রের মধ্যে হস্তী, বাঘ, সিংহ, বৃষ, মহিষ, হরিণ, সর্প, রাজহাঁস, ময়ূঁর ইত্যাদি। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দু:খ, আশা-আকাঙ্খার যে ছাপ সে চিত্রগুলোতো তুলে ধরা হয়েছে, তা সত্যই অপূর্ব ও প্রাণবন্ত। পূজারত ব্রাহ্মণ, স্ত্রী, পুরুষ যোদ্ধা, রথারোহী তীরন্দাজ, শিকারের মুহূর্তের শবর-শবরী, নৃত্যরত নারী-পুরুষ প্রভৃতি চিত্রগুলোতে বাঙালি সমাজ জীবনের যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে তা যেমন বাস্তবধর্মী তেমনি হৃদয়গ্রাহী। পোড়ামাটির ফলকগুলোতে তৎকালীন সময়ের গ্রাম বাংলার লোক শিল্পের এক বাস্তব পরিচয় ফুটে উঠেছে। সেই সাথে চিত্র ফলকগুলোতে সমসাময়িক কালের ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনের আলেখ্য ও অবস্থা সম্পর্কে জানা যায়।

ময়নামতি জাদুঘরের পরিচিত

সাধারণ মানুষের জ্ঞান আহরনের স্বার্থে জাতির শত শত বছরের কাব্য, শিল্পকলা, শিক্ষা, সংস্কৃতি অর্থাৎ গণমানুষের প্রাত্যেহিক জীবনে ধারার বস্তুগত উপাদানসমূহ পরিকল্পনা মাফিক এক বা একাধিক কক্ষে নিরাপদ পরিবেশ প্রদর্শন ও গবেষণা করার লক্ষ্যে উপস্থানকেই জাদুঘর বলে। জাদুঘর মানব ইতিহাস ও তার পরিবেশের বস্তুগত নিদর্শন সংগ্রহশালা। তবে এর কাজ ঐ সব নিদর্শন সংগ্রহ করাই জাদুঘরের কাজ নয়, এই সংগ্রহের মূল উদ্দেশ্য ইতিহাস সংস্কৃতি, পরিবেশের ধারণা মানুষের সামনে তুলে ধরা। এজন্য জাদুঘরে

১. নিদর্শন সংগ্রহ করা হয়।
২. সংরক্ষণ (conserve/preserve) করা হয়।
৩. এ বিষয়ে গবেষণা (peserce) করা হয়। আর সে গবেষণার আলোকে নথিভুক্ত করণ (documatation) করা হয়।
৪. সংরক্ষিত প্রত্নবস্তু প্রদর্শন (exbibit) করা হয়।

জাদুঘরের পরিসর বিভিন্ন ধরণের হতে পারে। যেমন- কোন একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রত্নবস্তু সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের জন্য সেই অঞ্চলের কাছাকাছি কোন স্থানে জাদুঘর স্থাপন করা হলে সেটি হবে আঞ্চলিক জাদুঘর। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে ময়নামতি জাদুঘর একটি আঞ্চলিক জাদুঘর। কারণ প্রাথমিক অবস্থায় শালবন মুড়া, কোটিলা মুড়া, চারপত্র মুড়া, রূপবান মুড়া, ইটাখোলা মুড়া, আনন্দ বিহার, রানীর বাঙলো, ভোজ বিহার প্রভৃতি খননস্থল গুলোতে প্রাপ্ত মূল্যবান প্রত্নবস্তু উদ্ধার করে এখানে সংরক্ষণ এবং প্রদর্শিত হচ্ছে।[২০]

লালমাই-ময়নামতি খননে আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তু আদর্শ সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের জন্য শালবন বিহারের দক্ষিণ পাশে ১৯৬৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ময়নামতি জাদুঘর। আয়শা বেগম এবং মোহাঃ মোশারফ হোসেন ও তোফায়েল আহমেদ দেওয়ান এদের মতে, ময়নামতি জাদুঘর ১৯৬৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।[২১] এটি বার্ড হতে প্রায় ২ কিলোমিটার দক্ষিণে এবং শালবন বিহার থেকে মাত্র ১০০ ফুট দক্ষিণে এক মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে ময়নামতি জাদুঘরের দ্বার উন্মুক্ত করেন। জাদুঘরের মূল প্রবেশপথ পশ্চিম দিকে।

ময়নামতি মূল জাদুঘর ভবনে গুরুত্বপূর্ণ পুরাবস্তু প্রদর্শনের জন্য স্থান সংকুলান না হওয়ায় ১৯৭০-৭১ সালে এর দক্ষিণ পাস বর্ধিত করায় ভবনটি ইংরেজি 'টি' বর্ণের আকার ধারণ করেছে।[২২] ২০১৭-১৮ সালে জাদুঘরটি সম্প্রসারিত করা হয় মূল জাদুঘরের উত্তর অংশে। সম্প্রসারিত অংশে মোট ২৭ টি প্রদর্শনী আধারের জন্য স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে। বর্তমানে সম্প্রসারিত অংশের শুধুমাত্র প্রদর্শনী

আধার ১-১২ নং আধারে কিছু প্রত্নবস্তু সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের জন্য রাখা হয়েছে বাকি আধারগুলো খালি অবস্থায় রয়েছে। জাদুঘর ভবনকে কেন্দ্র করে একটি বিভাগীয় বিশ্রামাগারসহ মনোরম ফুলের বাগানও গড়ে তোলা হয়েছে। ফলে পর্যটক, ছাত্র এবং গবেষকগণের নিকট গোটা প্রত্নস্থলটি একটি আর্কষণীয় শিক্ষা ও বিনোদন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।[২৩]

জাদুঘরের পূর্ব-পশ্চিম দিকে বরাবর দুটি প্রবেশদ্বার রয়েছে, তবে পশ্চিম পাশেরটিই প্রধান প্রবেশদ্বার। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা জাদুঘর ভবনটি ৬×৪×২ আয়তনের[২৪] অর্থাৎ ১.৮৩মি ×১.২২মি × ০.৬১মি পরিমাপের মোট ৪২টি দেয়াল ঘেঁষা প্রদর্শনী আধার রয়েছে। এই আধার গুলোতে মোট ৬৬৭৪ টি ছোট, মাঝারি ও বৃহৎ আকারের প্রত্নবস্তু স্থান পেয়েছে। প্রবেশপথের বাম দিকে থেকে প্রদর্শনী আধার-১ দিয়ে প্রদর্শনী শুরু করে ক্রমানুসারে চারদিক ঘুরে ঘুরে প্রবেশ পথের ডানদিকে ৪২ নম্বর প্রদর্শনী আধার প্রদর্শনী শেষ হয়েছে। জাদুঘরের প্রদর্শনী আধার বা শোকেস গুলো ১,২,৩ এভাবে পর্যায়ক্রমে সাজানো রয়েছে। লালমাই-ময়নামতি অঞ্চলে প্রাপ্ত প্রত্ননিদর্শন এসব প্রদর্শনী আধারে প্রদর্শিত হয়েছে। এছাড়া আরও অন্যান্য নিদর্শন জাদুঘরের ভিতরে বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শিত হচ্ছে।

প্রদর্শনী আধারগুলোতে পঞ্চাশের দশকে পরিচালিত প্রত্নাৎখননে উন্মোচিত স্থাপত্যিক ধ্বংসাবশেষ গুলোর ভূমি নকশা, ধাতুলিপিফলক, প্রাচীন মুদ্রা, মৃন্ময় মুদ্রিকা, পোড়ামাটির ফলক, ব্রোঞ্জের মুর্তি, লোহার পেরেক, পাথরের মূর্তি, গুটিকা, অলঙ্কারের অংশ এবং গৃহস্থালীতে ব্যবহৃত মাটির হাঁড়ি পাতিল ইত্যাদি প্রদর্শিত হয়েছে। এছাড়া প্রদর্শনী আধ্যায়ের ফাঁকে ফাঁকে মেঝের উপর জাদুঘর ভবনের বিভিন্ন স্থানে কিছু পাথরের এবং ব্রোঞ্চের মূর্তিও প্রদর্শনের আয়োজন করা হয়েছে। এসব মূর্তির কয়েকটি প্রাচীন সমতটের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সংগৃহিত। জাদুঘরে প্রদর্শিত প্রত্নবস্তু সম্পর্কে A.K.M. Shamsul alam বলেন, "Plans of the exceavated monuments copper plates terracotta sealings and figures terracotta plaques bronze sculptures and utersils iron objects, stone objects, coins, beads and ornaments and earthen wares."[২৫]

ময়নামতি জাদুঘরে সংরক্ষিত পোড়ামাটির ফলকচিত্র

শালবন বিহার ও আনন্দ বিহারের কেন্দ্রীয় মন্দিরের বাহির্ভাগ ছাড়াও রূপবান মুড়া, কুটিলা মুড়া, ইটাখোলা মুড়া, ত্রিরত্ন মুড়া, ভোজ বিহার ও রানীর বাঙ্গলো মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রচুর সংখ্যক পোড়ামাটির চিত্রফলক আবিস্কৃত হয়েছে। এগুলো বেশিরভাগ নওগাঁ জেলার পাহাড়পুর বিহার থেকে আবিস্কৃত পোড়ামাটির চিত্রফলকগুলোর প্রায় অনুরূপ। ফলকগুলো মসৃনভাবে লেই করা। মাটির দিয়ে গড়া। এগুলোতে বিধৃত চিত্রাবলীর শিল্পকর্মে শৈল্পিক অপরিপক্কতা থাকলেও সাধারণ মানুষের প্রাত্যাহিক অনুভূতি যথাযর্থ ভাবেই প্রতিফলিত হয়েছে। বিষয়বস্তু অত্যন্ত সাদামাটা হলেও যথেষ্ট প্রাণশক্তিতে ভরপুর।[২৬] অবশিষ্ট কিছু পোড়ামাটির চিত্রফলকের শিল্পগুণ গুপ্ত আমলের ধারা বহুন করছে এবং সেগুলোর সাথে মহাস্থানগড়ের নিকটবর্তী ভাসুবিহার ধাপের বিহার পাওয়া পোড়ামাটির চিত্রফলক গুলোর শৈল্পিক মিল রয়েছে। এমন একটি ফলক (নীলপদ্ম রচিত) বর্তমানে প্যারিসের ইউনেস্কো সদর দপ্তরে প্রদর্শিত আছে।[২৭]

ময়নামতি জাদুঘরের প্রদর্শনী আধারে যে সকল পোড়ামাটির ফলকচিত্র দেখা যায় সেগুলো ৭ম-৮ম শতাব্দীর। এগুলো নওগাঁ জেলার পাহাড়পুর ও বাংলাদেশের অন্যান্য প্রত্নকেন্দ্র থেকে আবিস্কৃত পোড়ামাটির ফলকচিত্রের অনুরূপ। ফলকচিত্রগুলো উন্নত মানের পলল দ্বারা তৈরি। দেশীয় এবং স্থানীয় শিল্প কৌশলের সমন্বয়ে এ সমস্ত শিল্পের উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। এ সমস্ত শিল্পকর্মে শৈল্পিক অপরিপক্কতা থাকলেও এতে সাধারণ অনুভূতি প্রতিফলিত হয়েছে এবং বাংলার লোক

শিল্পকে প্রসারিত করেছে। ফলকচিত্রের শৈল্পিক রীতি-নীতি অদ্ভুত হলেও এতে যথেষ্ট প্রাণশক্তির সঞ্চার করেছে। যা থেকে বিভিন্ন ভঙ্গিতে এ কারিগরি দক্ষতার তৈরী বাস্তবধর্মী কিছু নিদর্শন জাদুঘরে প্রদর্শন করা হয়েছে যা অনেকটা পাথর ও ব্রোঞ্জের মুর্তির মতই। ফলকচিত্রের প্রতিকৃতিতে অতিরিক্ত বৈচিত্র্য সৃষ্টি বিষয় বস্তুর মূল প্রাচুর্যকে বিভ্রান্ত করেছে। এতে বাংলার গ্রামাঞ্চলের সমস্ত বিষয়বস্তুই অন্তর্ভুক্ত আছে যা বাস্তব ও কাল্পনিক জীবনেও পরিলক্ষিত হয়।

ফলকচিত্রের বিষয়বস্তু ছিল মানব-মানবী, দেব-দেবী, অপ-দেবতা, বন্যপ্রাণী, গৃহপালিত পশু, জলজ প্রাণী (মকর, কুমির, মৎস্য প্রভৃতি), ময়ূর, হাঁস, ফুল-ফল, চাঁদ, সূর্য, মুকুট, ত্রিশূল, কীর্তিমুখ, ধর্মচক্র, যক্ষ, কিন্নর, গান্ধর্ব, জোড়া মাছ, জোড়া ঘোড়া, দুই মাথা এক দেহধারী সিংহ, নর্তক-নর্তকী, পক্ষী, জীব, জন্তু, বৃক্ষ, মল্লযোদ্ধা, তীরন্দাজ, উড়ন্ত নারী, নীল উৎপল, হাঁসের মুখে মুক্তার মালা, স্বর্গীয় বা নৈসর্গিক দৃশ্যবলী ইত্যাদি। পোড়ামাটির ফলকগুলোর আকৃতি আয়তাকার এবং এর গড় পরিমাপ ২০ সে. মি. দ্ধ ১৫ সে. মি. থেকে ৩০ সে. মি. দ্ধ ২০ সে. মি.।[২৮] ফলক চিত্রগুলো সে সময়ের সমাজ-সংস্কৃতি, চিন্তা-চেতনা, ধর্মীয় বিশ্বাস উপস্থাপনের সাথে সাথে নান্দনিক বৈশিষ্ট্যে আকর্ষণীয়। ফলকচিত্রের মানুষ ও দেবতার প্রতিকৃতিতে তৎকালীন সময়ের কেশ-বিন্যাসের প্রচলিত রীতি, পোশাক ও অলংকার পরিধানের ধারণা পাওয়া যায়। তৎকালীন অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সামগ্রিক জীবনালেখ্য ফুটে উঠেছে পোড়ামাটির ফলকগুলোতে।

নবম-দশম শতাব্দীর নির্মাণ স্তর থেকে প্রাপ্ত ভাসু বিহারের পোড়ামাটির ফলকচিত্রের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ফলকচিত্রে গুপ্ত যুগ অথবা আরও পূর্ববর্তী যুগের শিল্পকলার প্রভাব রয়েছে। বাংলার লোকয়ত শিল্পে ময়নামতি, পাহাড়পুর ও অন্যান্য প্রত্নকেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত পোড়ামটির ফলকচিত্রে অসাধারণ বৈশিষ্ঠ্যসূচক আর্কষণ সৃষ্টি করেছে। এর মধ্যে ময়নামতিতে যে সমস্ত পোড়ামাটির ফলকচিত্র আবিস্কৃত হয়েছে সেগুলোতে সবচেয়ে সুন্দর ও পরিপূর্ণতার অভিব্যক্তি ঘটেছে।[২৯]

ময়নামতি জাদুঘরে যে সকল পোড়ামাটির ফলকচিত্র প্রদর্শন করা হয়েছে সেগুলোর সমকালীন আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার প্রতিফলন সর্ম্পকে নিম্নে আলোচনা করা হলো।

প্রদর্শনী আধার ৯

চিত্র: ১-৭

শালবন বিহারে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলকচিত্র সমূহ আনুমানিক ৮ম শতাব্দী সময়কালের। এই আধারে ১০ টি পোড়ামাটির ট্যারাকোটা রয়েছে এগুলো সবগুলোই বাদামী রঙের। ফলকচিত্র সমূহ হলো: ঢাল ও তলোয়ার হস্তে যোদ্ধা (চিত্র নং-১), প্রনয়াসক্ত যুগল মূর্তি (চিত্র নং-২), একজন দেব বংশীয়ঃ রাজার হাতের গরুর ন্যায় প্রাণী, ঢাল ও তলোয়ার হস্তে তীরন্দাজ, উড়ন্ত স্ত্রী মূর্তি , ধনুক ও তীর হস্তে তীরন্দাজ প্রভৃতি এই ফলকচিত্র গুলোর মধ্যে দিয়ে ততকালীন সময়ে যোদ্ধারা কিভাবে যুদ্ধ করত বা যুদ্ধের পরিচালনা করা হতো। তাদের আত্মরক্ষার জন্য তারা কি ধরণের হাতিয়ার ব্যবহার করত সেই সম্পর্কে জানা যায়। ততকালীন মানুষের সামাজিক ও দৈনন্দিন কাজের বাস্তব চিত্র দেখা যায়। এছাড়া তাদের জীবন যাত্রার মধ্যে যে প্রেম-ভালবাসা ছিল তা সম্পর্কে শিল্পী তার মনের অনুভূতি পোড়ামাটির ফলক চিত্রে স্থান পেয়েছে।

প্রদর্শনী আধার ১০

চিত্র: ৮-১৬

পোড়ামাটির ফলকচিত্র সমূহ শালবন বিহারে প্রাপ্ত। ১০টি পোড়ামাটির ফলকচিত্র রয়েছে যার মধ্যে এক মস্তক বিশিষ্ট যুগল সিংহ, কীর্তিমূখ, সিংহের মুখ, গতানুগতিক সিংহ মূর্তি, দুই ঘোড়া, ধাবমান

অশ্ব, বানর, নব্য ররাহ ও মকর। প্রাচীনকালে তাদের বাহন, জীব-জন্তুর পরিচয়, পাখি ও আন্যান্য কিছুর কীর্তিমুখ রয়েছে যা ততকালীন সামাজিক অবস্থার চিত্র ফুটে উঠে। এই ফলকচিত্র গুলো দিয়ে জানা যায় ততকালীন সময়ে মানুষের সাথে বন্য প্রাণী ও পশুর সাথে একটি সক্ষতা ছিল। এর মাধ্যমে যেমন সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে জানা যায় তেমনি অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কেও জানা যায়। কারণ তাদের প্রধান পেশা ছিল শিকার করা। এছাড়াও তারা শিকার করে নিজেদের চাহিদা পুরণের পাশাপাশি অতিরিক্ত মাংস এবং বন্য পশু ও জীব-জন্তুর চামড়া, দাঁত, সিং, হাড় প্রভৃতি বিক্রয় ও হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করত।

প্রদর্শনী আধার ১১

চিত্র: ১৭-২৭

এই আধারে ১১টি চিত্রফলক রয়েছে। এখানে একটি বিশেষ লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো গ্রাম-বাংলার চিত্র/পরিবেশ স্থান পেয়েছে। মানুষের দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত গবাদী পশু যা দিয়ে নিজেদের কৃষি কাজ, ফসল আনা-নেওয়া বা বার বহনের কাজ, যাতায়াত সহ প্রভৃতি কাজ করতেন। চিত্রগুলো হলো: মকর এর মস্তক, হাতি, হস্তীকে আক্রোমনোদ্যত সিংহ, বানর পৃষ্ঠে শবক, উড়ন্ত চাদর সহ ভেড়া, হরিণ, মহিষ, ষাঁড়, সাপ ও বেজীর লড়াই, বানর প্রভৃতি স্থান পেয়েছে। অর্থাৎ শিল্পিরা যে গ্রাম-বাংলার পরিবেশের সাথে যুক্ত ছিল তা স্পষ্ট বুঝা যায়। চিত্রগুলো থেকে বুঝা যায় যে এ অঞ্চলের মানুষ খুবই সাধারণ জীবন যাপন করত। রাজ্যের শাসক শ্রেণীর সাথে সাধারণ মানুষের যোগাযোগ ছিল এবং পশু পালন ও বণ্য প্রাণী শিকার করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করত।

প্রদর্শনী আধার ১২

চিত্র: ২৮-৩৮

এই আধারে দেখা যায় গ্রাম-বাংলার প্রকৃতিতে ফুটন্ত ফুল। যা ততকালীন সময়ে শাসকদের মনের ভাব, সৌন্দর্যের প্রতিচায়া হিসেবে ফুল, পাখি ও মাছ ইত্যাদি স্থান পেয়েছে। তাদের প্রিয় পাখি ময়ুর ও ফুল, পদ্ম প্রভৃতি বুঝা যায়। এই আধারের চিত্র সমূহ হলো: মৎস্য, ফুল হাতে আহার সংগ্রহের রাজহংষ, পদ্ম, ময়ুর, মুক্তার মালা মুখে রাজহংস, রাজহংস, চন্দ্র সূর্যের প্রতীকরূপে পদ্ম, কোরকসহ পদ্ম, মৃনাল আহাররত রাজহংস, পদ্মের উপরে পক্ষী, পূর্ণ প্রস্ফুটিত পদ্ম। মুক্তার মালা মুখে রাজহংস চিত্রটি প্রতিকী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ততকালীন সময়ে রাজা বা শাসকদের অর্থের অভাব ছিল না এবং তারা ভোগ বিলাস ও সৌন্দর্য্য বর্ধনের কাজে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতেন।

প্রদর্শনী আধার ১৩

চিত্র: ৩৯-৪৮

এই প্রদর্শনী আধারে বিশেষ লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো ধর্মচক্র এর উপস্থিতি। সেই সময়ে তাদের দৈনন্দিন কাজের সাথে ধর্ম কর্মের মাধ্যমে জীবন ও জীবিকা পরিচালনা করতেন। মোট ১০টি চিত্র রয়েছে যা তাদের দৈনন্দিন কাজের সাথে জড়িত ছিল। রাজার অবক্ষ চিত্র, বুদ্ধ, কিন্নরী, পক্ষীর ন্যায় পুচ্ছ বিশিষ্ট কুম্ভীর মস্তক, ত্রিশূল, দেব বংশীয় রাজা, কিমপুরুষ, ধর্মচক্র, মাল্য হস্তে উড়ন্ত গন্ধর্ব, অভয়দান মুদ্রার যুদ্ধ, ফুলদানী প্রভৃতি স্থান পেয়েছে। এই চিত্রগুলো থেকে জানা যায় যে ততকালীন সময়ের শাসক শ্রেণী ও সাধারণ মানুষ তাদের প্রতিদিনের কাজ পরিচালনাসহ সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

প্রদর্শনী আধার ১৪

চিত্র: ৪৯-৫০

কোরসহ পদ্ম, বিভিন্ন মাপের ইট, মানুষের পদচিহ্ন, গরুর পদচিহ্ন, চার আঙ্গুল বিশিষ্ট শিশুর পদচিহ্ন, প্রাচীন কালের পোড়ামাটির ইট প্রভৃতি। এখানে মানুষের বিশেষ কিছু চিহ্ন দেখা যায় যা দিয়ে মানুষের শৈশবকাল থেকে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের প্রমাণ পাওয়া যায়। তাছাড়া বিভিন্ন প্রাণীর পদচিহ্ন দেখে এদের উপস্থিতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

প্রদর্শনী আধার ২৯

চিত্র: ৫১-৫৫

আনন্দ বিহার খননে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলকচিত্র সমূহের সময়কাল আনুমানিক ৭ম-১২শ শতাব্দী। এখানে আনন্দ বিহার উৎখননে প্রাপ্ত কিছু পুরাবস্তু স্থান পেয়েছে। যেমন: পোড়ামাটির চিত্রফলক, গুপ্তানুকৃতি, স্বর্ণমুদ্রা, পোড়ামাটির মুদ্রক মুদ্রিকা, নব্য প্রস্তর যুগের হাতিয়ার, পোড়ামাটির গুটিকা, নিবেদন, স্তূপ, পোড়ামাটির ডিবরি ইত্যাদি। এই চিত্রফলক সমূহ থেকে বুঝা যায় যে ততকালীন সময়ে মানুষের আর্থনৈতিক অবস্থা ভাল ছিল। তাছাড়া জীবিকার জন্য বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত। তারা হিংস্র প্রাণী থেকে বাছার জন্য বিভিন্ন হাতিয়ার ব্যবহার করত। যা এই হাতিয়াগুলো থেকে বুঝা যায়।

প্রদর্শনী আধার ৩০

চিত্র: ৫৬

আনন্দ বিহার খননে প্রাপ্ত পোড়ামাটির পাত্র, পোড়ামাটির বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রী, পোড়ামাটির ফলকচিত্র প্রভৃতি প্রত্নবস্তু স্থান পেয়েছে এই প্রদর্শনী আধারে। কিন্নারী, হাতি, পদ্ম গাছ, ঘোড়ার উপর বৌদ্ধ প্রভৃতি চিত্র গৃহপালিত প্রাণী ও প্রাকৃতিক ফুলগাছ যা বাংলার চিরাচরিত রূপ স্থান পায়। এই চিত্রগুলোর মাধ্যমে ততকালীন সময়ের ধর্মীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে জানা যায়।

প্রদর্শনী আধার ৩১

চিত্র: ৫৭

আনন্দ বিহার খননে প্রাপ্ত বিভিন্ন পোড়ামাটির চিত্রের নমুনা কয়েকটি অলঙ্কৃত ইট প্রদর্শন করা হয়েছে এই আধারে। চিত্র ফলক গুলোতে স্থান পায় পদ্ম, দাঁতের পাট ও ক্রমোন্নত ধাপ ইট এগুলো প্রধানত পুরাস্থাপনার আলিসা সজ্জিত করনের কাজে ব্যবহৃত হতো। এগুলো দিয়ে স্থাপনা নির্মাণ করত এবং যাদের প্রচুর অর্থ ছিল তারাই শুধু অলংকৃত ইট ব্যবহার তরতে পারত। এর মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার প্রমাণ পাওয়া যায়।

প্রদর্শনী আধার ৩৭

চিত্র: ৫৮-৬০

শালবন বিহারে প্রাপ্ত ছোট ছোট ১৬টি অলংকৃত ইট এবং পূর্ণ প্রস্ফুটিত পদ্ম প্রদর্শন করা হয়েছে। অলংকৃত ইটগুলোর মধ্যে ক্রমোন্নত ধাপ, পাতা, শিকল এবং দাঁত রূপচিহ্ন বিকৃত করা হয়েছে। এ ইটগুলো ইমারতের আলিসা অংশ অলংকরণের কাজে ব্যবহার করা হত। এখানে প্রস্ফুটিত পদ্ম ও অলংকৃত ইটগুলো তাদের দালান বা স্থাপনা নির্মাণের পর মেঝে বা দেয়ালের অলংকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

কুমিল্লা ময়নামতি জাদুঘরে সংরক্ষিত পোড়ামাটির চিত্রফলকগুলো তৎকালীন সমাজ জীবন ও সংস্কৃতির এক জীবন্ত রূপকল্প আমাদের সামনে তুলে ধরে। বিভিন্ন ভঙ্গিতে স্ত্রী পুরুষ, জীবজন্তু,

পাখি, মানুষের দেবতা, অপদেবতা, ফুল, লতাপাতা, নর্তকী, যোদ্ধা, পশু, পাখি প্রভৃতি সব কিছুই এসব চিত্রফলকের বিষয়বস্তু। এগুলো প্রাচীন সমতটের লোকায়ত শিল্পের এক অপূর্ব চিত্রপট।[৩০] এছাড়াও এই জাদুঘরে প্রদর্শন করা হয়েছে বিভিন্ন পোড়ামাটির দ্রব্য, ঘুটিকা, সিল, নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিসপত্র (হাড়ি, পাতিল, চিদ্র যুক্ত পাত্র, ফুলদানি প্রভৃতি) ও পোড়ামাটির অন্যান্য প্রত্নবস্তু। পোড়ামাটির প্রত্নবস্তু ছাড়াও এই জাদুঘরে প্রদর্শিত হয়েছে বিভিন্ন প্রত্নস্থলে প্রাপ্ত কৃষ্ণ পাথরের মূর্তি, বেলে পাথরের মূর্তি, পিতলের মূর্তি, ব্রোঞ্জের মূর্তি, কাঠের মূর্তি সহ আরোও অনেক প্রত্নবস্তু।

পোড়ামাটির ফলকচিত্রে আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা

কুমিল্লার প্রাচীন অধিবাসীরা পোড়ামাটির ফলকচিত্রের মাধ্যমে তাদের দৈনন্দিন জীবন, বৈষয়িক জীবন, আহার, ধর্ম-কর্ম, আনন্দ-বেদনা, শিল্প-সংস্কৃতি, অর্থনীতি প্রভৃতি সবকিছুই ফুটিয়ে তুলেছেন। শিল্পীরা তার চারপাশের মানুষ, দেব-দেবীর মূর্তি, পশু-পাখি, গাছ, লতা-পাতা প্রভৃতির চিত্র মনের মাধুরী মিশিয়ে লোকায়ত সহজ জীবনের চিত্র তুলে ধরেছেন। ময়নামতি জাদুঘরে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলকগুলো মৌলিক বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণভাবেই লৌকিক এবং সাধারণ লোকায়ত কৃষি নির্ভর জীবনের প্রতিফলন। স্থিতি ও গতির বিভিন্ন অবস্থায় বস্তু ও প্রাণী জগতের সকল উপাদান কখনো আবেগ আবার কখনো অপূর্ব গতিময়তা দিয়ে শিল্পরূপ দিয়েছেন শিল্পীরা।[৩১] ধর্মগত উচ্চকোটি স্তরের ঐতিহ্যগত শিল্পের কোন স্তর এমন সুবিস্তৃত সামাজিক পরিবেশ, মানবিক কল্পনা, অর্থনৈতিক চিত্র, অনুভূতির বৈচিত্র্য প্রাত্যহিক জীবনের বাস্তব ঘটনা ও অভিজ্ঞতার এমন সংযোগ এমন স্বতোচ্ছসিত ভঙ্গিমা ও চালচলন প্রকাশের এমন সজীব ও পরিপাটি ছন্দের পরিচয় দুর্লভ।[৩২] ময়নামতি অঞ্চলের শিল্পিগণ পরিবেশ সচেতনতা ও মানসিক সক্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায় পোড়ামাটির ফলকগুলোর বাস্তব এবং কাল্পনিক বস্তুর নিদর্শন দেখে। ঢাল-তলোয়ারসহ যোদ্ধা, তীর-ধনুক হাতে ধানুকী, প্রেমালাপ-মগ্ন নর-নারী, উড়ন্ত নারী, কুস্তিগীর প্রভৃতির যেন একটি মানবিক জগতের জীবন্ত রূপ দিয়েছে। নৃত্য-গীত-বাদ্য এবং অভিনয় শিল্প প্রাচীন বাঙালী সমাজের নৈপুন্য ও অনুভূতিগুলো পোড়ামাটির ফলকে ফুটিয়ে তুলেন। যা স্পষ্টত নৃত্যরত নর-নারীর দৃশ্য মূর্তির গাত্রে ও পোড়ামাটির ফলকচিত্রে প্রমাণ পাওয়া যায়। নিচু ও নিম্নবৃত্ত পরিবারের মেয়েদের দাসী হিসেবে কেনা-বেচা হতো। এর মাধ্যমে নৃত্য-গীতের পাশাপাশি সমাজের নৈতিক স্খলনের চিত্রও পাওয়া যায়।[৩৩] প্রাণী জগতের জীব-জন্তু, ধাবমান অশ্ব, দৃপ্ত চেহারার সিংহ, ফণা তোলা সাপের সাথে বেজির লড়াই, পাখি প্রভৃতির চিত্রে গতিশীলতা ও বাস্তবতাকে ধরে রেখেছে। মুক্তার ছড়া ধারণকারী রাজহংস এবং পদ্মনাল আহারে রাজহংস এই চিত্রগুলোতে অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে ধারনা পাওয়া যায়। এ অঞ্চলের মানুষের প্রধান পেশা ছিল কৃষিকাজ, শিকার করা এবং মাছ শিকার। এছাড়াও বিভিন্ন পেশাজীবীর মানুষের বসবাস ছিল। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করত এবং এক দেশ থেকে অন্য দেশে ভ্রমন করত। পোড়ামাটির চিত্রফলকগুলোতে এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কেও ধারনা পাওয়া যায়। বুদ্ধ, স্তূপ, ত্রিরত্ন ধর্মচক্র ক্ষিশূল ও কীর্তিমুখ প্রভৃতি ধর্মীয় প্রতীক। কিণ্নরী, গন্ধর্ব, বিদ্যাধরী, যক্ষ প্রভৃতি কাল্পনিক জগতের প্রাণী যা অর্ধ দৈব ও অপার্থিব জীবের প্রতিছবি।[৩৪] পোড়ামাটির চিত্রফলকগুলোতে শাসক শ্রেণী ও সাধারণ লোকের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন প্রতিফলিত হয়েছে।

গবেষণার সীমাবদ্ধতা

আলোচ্য প্রবন্ধটি কুমিল্লা জেলার ময়নামতিতে অবস্থিত ময়নামতি প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘরে সংরক্ষিত পোড়ামাটির ফলকচিত্র কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠা পর্যটন কেন্দ্রের সম্প্রসারণ ও বিকাশে এর ভূমিকা

আলোচনা ও পর্যালোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। অন্যথায় এর কলেবর অনেক বেড়ে যেত। কুমিল্লা জেলার প্রত্নস্থল এর মধ্যে লালমাই-ময়নামতি এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আরও অনেক প্রত্নস্থল রয়েছে যা পর্যটন ও পাঠক, গবেষকদের কাজ করার সুযোগ রয়েছে। অধিকতর নিবিড় মাঠ জরিপ, পর্যবেক্ষন ও পঠন-পাঠনের, মাধ্যমে তথ্য আহরণ করতে পারলে সেই আঙ্গিক অনুধাবন ও বিশ্লেষণ সম্ভব। আলোচ্য গবেষণাটি সম্পূর্ণ করতে কিছু প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। সেগুলো হলোঃ

- আলোচ্য বিষয়ে সহায়ক বই, পুস্তকের অপ্রতুলতা এক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহ সীমাবদ্ধতা সৃষ্টি করেছে।
- জাদুঘরে তথ্য সংগ্রহ করতে এবং প্রয়োজনীয় ছবি তুলতে প্রতিবন্ধকতা দেখা দিয়েছে।
- ভাষাগত প্রতিবন্ধকতা ও সীমাবদ্ধতা তৈরী করেছে।
- সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পূর্ববর্তী উল্লেখযোগ্য গবেষণা, প্রতিবেদন ও দিক নির্দেশনা না থাকায় গবেষণা কর্মটিকে সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হতে হয়েছে।
- বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও চেষ্টা ছিল শতভাগ সামর্থ্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে বাস্তব সম্মত একটি গবেষণা করা এবং প্রতিবেদন তৈরী করা।

মন্তব্য

মৃৎশিল্পিগণ তাদের জীবিকার তাগিদে বা আনন্দের ছলে যে রূপ সৃষ্টি করেছে পোড়ামাটির ফলকগুলোতে তাতে গ্রাম বাংলার মানুষের জীবনের মার্জিত রুচির পরিচয়, উচ্চ ভাবানুভুতি, জটিল মননশিলের পরিচয় পাওয়া না গেলেও। সাধারণ বৈশিষ্ট্য রচনা বিন্যাস, গঠন প্রণালী, শৈলী ও কারুকার্য এবং সৌন্দর্য বিকাশের দিক দিয়ে বিচার করলে ফলকগুলোর মধ্যে অনেক শ্রেণীভেদ করা যায়। এ সকল চিত্রে অলংকার ও পোশাক পরিচ্ছেদের রূপায়নে আঙ্গিকগত ও রীতিগত পরিপূর্ণতা লক্ষ্য করা যায়। দেহ ভঙ্গিতে ঈষৎ আড়ষ্টতা, মূর্তি, জীবজন্তু, পদ্মফুল, লতাপাতা প্রভৃতি শিল্পরীতির গতিশীলতা ও স্বাচ্ছন্দ্য স্পষ্ট এবং বলিষ্ট প্রকাশভঙ্গি। ফলকগুলোতে কৃষি নির্ভর জীবন বা সমাজ কাঠামোর চিত্র, ততকালীন সামাজিক অবস্থার চিত্র পাওয়া যায়। নিদর্শনগুলো থেকে সমকালীন মানুষের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবন প্রতিফলিত হয়েছে। মৃৎশিল্পিগণ জীবিকা পরিচালনা করতেন এই সকল চিত্র অঙ্কন করে ও পোড়ামাটির বিভিন্ন জিনিস তৈরী করে। রাজারা তাদের প্রাসাদ ও ধর্মীয় ইমারতগুলো সজ্জিত করন, সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির কাজে ব্যবহার করতেন বিভিন্ন পোড়ামাটির ফলকচিত্র দিয়ে। এর মাধ্যমে তাদের রুচিবোধ ও ততকালীন অর্থনৈতিক অবস্থার চিত্র পাওয়া যায়। ময়নামতি জাদুঘরে রক্ষিত পোড়ামাটির ফলকগুলো বিশ্লেষন করলে দেখা যায় চিত্র গুলোতে স্থান পেয়েছে ততকালীন সময়ের ধর্মীয় বিষয়, প্রাকৃতিক দৃশ্য, দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাণীর উপস্থিতি, প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে সাপ ও ব্যাঙ এর লড়াই, বিভিন্ন জীব-জন্তুর সাথে মানুষের ও অন্যান্য প্রাণীর সাথে লড়াই, যুদ্ধের প্রস্তুতি ও যুদ্ধের লড়াই প্রভৃতি বিষয় স্থান পায়।

উপসংহার

ময়নামতি জাদুঘরে সংরক্ষিত পোড়ামাটির চিত্রফলক থেকে সমকালীন আর্থ-সামাজিক ও সংস্কৃতিক চিত্র সম্পর্কে সঠিক তথ্য ও বাস্তব বিষয় সম্পর্কে জানা যায়। তৎকালে যাপিত জীবনের সংস্কারমুক্ত, প্রকৃতির সাথে নিবিড় সম্পর্কযুক্ত আনন্দঘন চলমান জীবনের 'প্যানোরমিক' দৃশ্যপট বিধৃত হয়েছে এসব পোড়ামাটির ফলকচিত্রে। এর মাধ্যমে আমরা তৎকালীন সমাজ জীবনের সম্বন্ধে সম্যক ধারণার সাথে সাথে সে সময়ের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থাও জানতে পারি। তাই এই সকল

পোড়ামাটির ফলকচিত্র গুলো ইতিহাসের সঠিক তথ্য নির্ণয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই পোড়ামাটির ফলকচিত্রগুলোকে বিজ্ঞানভিত্তিক উপায়ে সংরক্ষণ করা হলে পরবর্তী প্রজন্ম এই বিরল ফলকচিত্রগুলো দেখতে পাবে এবং প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষকরা যেমন উপকৃত হবে তেমনিভাবে প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাস ও ঐতিহ্য অনেক সমৃদ্ধ হবে। ভবিষ্যৎ গবেষক, পাঠন-পাঠনে, সঠিক তথ্য বিনির্মাণে, পর্যটকদের জন্য কুমিল্লা ময়নামতি জাদুঘর ইতিহাসের স্বাক্ষি হয়ে থাকবে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১ A.K.M. Shamsul Alam, *Mainamati*, (Dhaka: Department of Archaeology and Museums, 2nd Edition, 1982), p. 24

২ মোহা. মোশাররফ হোসেন ও তোফায়েল আহমেদ দেওয়ান, *ময়নামতি-লালমাই*, (ঢাকা: প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, পরিমার্জিত সংস্করণ: জুন, ২০১৫), পৃ. ৪৭

৩ এ. বি. এম. হোসেন, *স্থাপত্য*, (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭), পৃ. ৪

৪ Abu Imam, *Excavation at Mainamati*, (Dhaka: The International Centre for Study of Bangla Art (ICSBA), 2000), pp. 25-45

৫ শামসুজ্জামান খান, *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা-কুমিল্লা*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, মার্চ ২০১৪), পৃ. ২৪

৬ আবুল কাসেম, *কুমিল্লার ইতিহাস (আদি পর্ব)*, (ঢাকা: গতিধারা প্রকাশনি, ২০০৮), পৃ. ২১

৭ Dilip K. Chakrabarti, *Ancient Bangladesh*, (Dhaka: URL updated edition, 2001), pp. 31-37

৮ শামসুজ্জামান খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫

৯ মোহা. মোশাররফ হোসেন ও তোফায়েল আহমেদ দেওয়ান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২

১০ আয়শা বেগম, *প্রত্ননিদর্শন: কুমিল্লা*, (ঢাকা: বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ২০১০), পৃ. ২৫

১১ M. Abu Bakar, *Records of the Geological Survey of Bangladesh*, Vol.1, Part-2, (Dacca: 1977), p. 54

১২ Firoz Mahmud, *Prospects of Material Folk Culture Studies and Folk Life Mmuseums in Bangladesh*, (Dhaka: Bangla Academy, 1993), p. 97

১৩ বরুণকুমার চক্রবর্তী, *বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ*, (কলকাতা: অর্পণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, ২০০৪), পৃ. ২০৬

১৪ আনিসুজ্জামান, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, প্রথম খন্ড, ১৯৮৭), পৃ. ১৯৮

১৫ প্রদ্যোত ঘোষ, *বাংলার লোক শিল্প*, (কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ২০০০), পৃ. ৫৫

১৬ David J. McCutchion, *Late Medieval Temples of Bengal*, (Calcutta: The Asiatic Society, 1972), p. 9

১৭ ড. নূরুল আমীন, "নয়াবাদ মসজিদ পোড়ামাটির ফলকচিত্রে প্রাণির মোটিফ" *ইনিস্টিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নাল (আইবিএস জার্নাল)*, (রাজশাহী: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, আগস্ট ২০১৪), খন্ড ২১, সংখ্যা ১৪২০, ISSN-1561-798X, পৃ. ৮১-৯২

১৮ মোসা. আশায়ারা খাতুন, "বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে রক্ষিত কতিপয় পোড়ামাটির ফলক", *ইনিস্টিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নাল (আইবিএস জার্নাল)*, (রাজশাহী: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, মার্চ ২০১২), খন্ড ১৯, সংখ্যা ১৪১৮, ISSN-1561-798X, পৃ. ১৩১-১৪৪

১৯ আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, *বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ*, (ঢাকাঃ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ১৯৮৪), পৃ. ২৪৫
২০ মোহা. মোশাররফ হোসেন ও তোফায়েল আহমেদ দেওয়ান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭
২১ আয়শা বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৪
২২ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৪
২৩ মোহা. মোশাররফ হোসেন ও তোফায়েল আহমেদ দেওয়ান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭
২৪ A.K.M. Shamsul Alam, *op.cit.*, p. 79
২৫ *Ibid*, p. 79
২৬ আয়শা বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৬
২৭ মোহা. মোশাররফ হোসেন ও তোফায়েল আহমেদ দেওয়ান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১
২৮ আয়শা বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯
২৯ মোহা. মোশাররফ হোসেন ও তোফায়েল আহমেদ দেওয়ান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১
৩০ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১
৩৩ আবুল কাসেম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪০
৩২ ড. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস*, (কলিকাতাঃ আদিপর্ব, ২০০৪), পৃ. ৬২৫
৩৩ আবুল কাসেম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৬
৩৪ আনিসুজ্জামান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৬

আলোকচিত্র

চিত্র ১ঃ ঢাল ও তলোয়ার হস্তে যোদ্ধা

চিত্র ২ঃ প্রনয়াসক্ত যুগল মূর্তি

চিত্র ৩ঃ রাজার হাতের গরুর ন্যায় প্রাণী

চিত্র ৪ঃ ঢাল ও তলোয়ার হাতে যোদ্ধা

চিত্র ৫: ঢাল ও তলোয়ার হস্তে তীরন্দাজ

চিত্র ৬: উড়ন্ত স্ত্রী মূর্তি

চিত্র ৭: ঢাল ও তলোয়ার হস্তে যোদ্ধা

চিত্র ৮: এক মস্তক বিশিষ্ট যুগল সিংহ

চিত্র ৯: কীর্তিমুখ

চিত্র ১০: সিংহের মুখ

চিত্র ১১: গতানুগতিক সিংহ মূর্তি

চিত্র ১২: দুই ঘোড়া

চিত্র ১৩: ধাবমান অশ্ব

চিত্র ১৪: বানর

চিত্র ১৫: নব্য ররাহ

চিত্র ১৬: মকর

চিত্র ১৭: মকর এর মস্তক

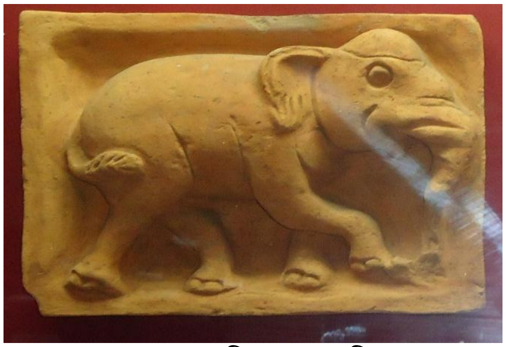

চিত্র ১৮: হাতি

চিত্র ১৯: হস্তীকে আক্রোমনোদ্যত সিংহ

চিত্র ২০: বানর পৃষ্ঠে শবক

চিত্র ২১: উড়ন্ত চাদর সহ ভেড়া

চিত্র ২২: হরিণ

চিত্র ২৩: হরিণ

চিত্র ২৪: মহিষ

চিত্র ২৫: হরিণ

চিত্র ২৬: ষাঁড়

চিত্র ২৭: সাপ ও বেজীর লড়াই

চিত্র ২৮: যুগল মৎস্য

চিত্র ২৯: ফুল হতে আহার সংগ্রহের রাজহংষ

চিত্র ৩০: পদ্ম

চিত্র ৩১: ময়ুর

চিত্র ৩২: মুক্তার মালা মুখে রাজহংস

চিত্র ৩৩: মৃনাল আহাররত রাজহংস

চিত্র ৩৪: চন্দ্র সূর্যের প্রতীক রূপেপদ্ম

চিত্র ৩৫: কোরকসহ পদ্ম

চিত্র ৩৬: পদ্ম

চিত্র ৩৭: পদ্মের উপরে পক্ষী

চিত্র ৩৮: পূর্ণ প্রস্ফুটিত পদ্ম

চিত্র ৩৯: ফুলদানী

চিত্র ৪০: পক্ষীর ন্যায় পুচ্ছ বিশিষ্ট কুম্ভীর মস্তক

চিত্র ৪১: ত্রিশূল

চিত্র ৪২: কিমপুরুষ

চিত্র ৪৩: দেব বংশীয় রাজা

চিত্র ৪৪: কিন্নরী

চিত্র ৪৫: ধর্মচক্র

চিত্র ৪৬: কিন্নরী

চিত্র ৪৭: মাল্য হস্তে উড়ন্ত গন্ধর্ব

চিত্র ৪৮: অভয়দান মুদ্রার যুদ্ধ

চিত্র ৪৯: কোরসহ পদ্ম

চিত্র ৫০: চার আঙ্গুল বিশিষ্ট শিশুর পদচিহ্ন

চিত্র ৫১: নৃত্যরত নারী

চিত্র ৫২: গণেষ

চিত্র ৫৩: যুগল রাজহংস

চিত্র ৫৪: রাজহংস

চিত্র ৫৫: হাতিয়ার

চিত্র ৫৬: পোড়ামাটির কয়েকটি ফলকচিত্র

চিত্র ৫৭: অলংকৃত ইট

চিত্র ৫৮: পূর্ণ প্রস্ফুটিত পদ্ম

চিত্র ৫৯: অলংকৃত ইট

চিত্র ৬০: অলংকৃত ইট